জাতীয় শোক দিবস

দ্বিধাবিভক্ত পরাধীন জাতিকে সুসংগঠিত করে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করা এবং সঠিক নেতৃত্ব দেওয়া সহজ কাজ নয়। অথচ এই কঠিন কাজটি বঙ্গবন্ধু খুব সহজেই করতে পেরেছিলেন।

স্বাধীকার থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম সবই পরিচালনা করেছেন শেখ মুজিবুর রহমান অসীম দক্ষতা ও যোগ্যতায়। তাঁর ছিল মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার মতো অসাধারন বজ্রকণ্ঠ। অনলবর্ষী বক্তা হিসেবে তাঁর বিপুল খ্যাতি ছিল।

অথচ সবার সেরা আর বাঙালির প্রাণপ্রিয় এই নেতাকে ঘাতকেরা কি নিষ্ঠুরভাবেই না হত্যা করলেন! সেই সাথে ঘাতকেরা শুধু একজন মানুষকেই হত্যা করেনি, হত্যা করেছে।

১৬ কোটি বাঙালির পিতাকে হত্যা করে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যকে হত্যা করেছে সমাজের নিরীহ, অত্যাচারিত, শোষিত, নির্যাতিত সকল মানুষের আশা আকাঙক্ষার সত্য প্রতীককে।

ঘাতকেরা বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে কালো অধ্যায় রচিত করেছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চিত্রকর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার মাধ্যমে। ১৫ই আগস্ট জাতির জীবনের এক কলঙ্কময় দিন। এই দিবসটি জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করে বাঙালি জাতি।

বঙ্গবন্ধু এবং জাতীয় শোক দিবস

বাঙালি জাতির জীবনে যে অল্প কয়েকজন মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করতে পেরেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর উদার আহ্বানে একদিন জেগে উঠেছিল সমগ্র বাঙালি জাতি। তিরিশ লক্ষ বাঙালির রক্তে রঞ্জিত এ বাংলাদেশের তিনি হয়ে উঠেছিলেন মুক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন সকল প্রেরণার উৎস। পৃথিবীর খুব কম রাজনৈতিক নেতা তাঁর মতো এত ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা লাভ করতে পেরেছিলেন। যোজন যোজন দূরের স্বাধীনতার স্বপ্নকে তিনি বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন। অথচ তাকেই সেনাবাহিনীর বিপদগামী কিছু সামরিক অফিসার কি নির্মমভাবেই না হত্যা করলেন।

এজন্য এই দিনটিকে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কিত দিবস হিসেবে দেখা হয়। ঘাতকেরা সেদিন স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকারকে হত্যা করার মাধ্যমে বাঙালির যে অপূরণীয় ক্ষতি করেছেন তার প্রতিদান বাঙালি হয়তো কোনোদিন কোনোসময় দিতে পারবে না।

বঙ্গবন্ধু এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি একজন নেতা হিসেবে একজন রাজনৈতিক কর্মীর আদর্শ, পিতা হিসেবে একটি জাতির আশ্রয় আর ভরসার স্থল, পাহাড়ের ন্যায় কঠিন হয়ে সত্য আর কুসুমের ন্যায় কোমল হয়ে একজন অভাবী দুঃখী মানুষের ভরসার প্রতীক।

এজন্য ঘাতকেরা সহ সবাই জানত এই একটি মানুষ পারে না এমন কোনো অসাধ্য কাজ এই বাংলায় নেই। সুতরাং সদ্য স্বাধীনতা অর্জন করা স্বাধীন ভূ-খন্ড বাংলাদেশের অগ্রগতি থামাতে কিংবা বাংলাদেশের জয়রথ বন্ধ করতে এই মানুষটিকে নির্মূল করা খুব দরকার।
ঘাতকের বুলেটের আঘাতে শেখ মুজিবের দেহাবসান হয়ে থাকলেও শেখ মুজিবের অবসান এই বাংলা থেকে কখনোই সম্ভব নয়। তিনি আজীবন তাঁর কর্মের মাধ্যমে বেঁচে থাকবেন সকল বাঙালি অন্তরের অন্তঃস্থলে।

অকৃতজ্ঞ বাঙালি তাঁর কৃতজ্ঞতার মূল্য দিতে সারাজীবন ধরে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে যাবে তাদের প্রাণপ্রিয় এই নেতাকে। সেজন্যে ১৫ই আগষ্ট বাঙালির জীবনের সবচেয়ে বিষাদময়, কলঙ্কিতময় এবং শোকের দিন। এদিন বাঙালি দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে স্মরণ করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

১৫ আগস্টের প্রেক্ষাপট

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারি তারিখ হতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন কার্যকর ছিল। এ সময়ে অর্থাৎ মাত্র ৩ বছর ৮ মাসের মাথায় স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী শেখ মুজিবের একক ও সর্বাত্মক নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের পতন ঘটে ও নেতৃত্বের অবসান হয়। নিচে এর জন্য দায়ী কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হলো।

১. সেনাবাহিনীর প্রতি উপেক্ষা

বাংলাদেশ আওয়ামলী লীগ সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের প্রতি উল্লেখযোগ্যভাবে গুরুত্ব দেয় নি।
পাকিস্তান ফেরত সামরিক অফিসারদের প্রতি বৈরী মনোভাব ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত অফিসারদের দ্রুত পদোন্নতি, প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় – বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাসকরণ এবং সামরিক বাহুনীর সমান্তরাল রক্ষীবাহিনী তৈরী ও এর দ্রুত উন্নয়ন এবং এর উপর সরকারের নির্ভরশীলতা সামরিক বাহিনীর লোকদের মধ্যে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই প্রচন্ড ক্ষোভের সঞ্চার করে।
তাই ক্ষমতাসীন সরকারের দলীয় লোকদের সীমাহীন লোভ ও দুর্নীতির প্রেক্ষাপটে মুজিব সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাসের সুযোগে সেনাবাহিনীর কতিপয় বিপদগামী অফিসার ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট রাতে শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে।

২. রাজনৈতিক কারণ

১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী সংগঠন করে আওয়ামী লীগ সরকার দেশের সমস্ত রাজনৈতিক তৎপরতা ও রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করে। ফলে জনসাধারণের মনে এ নিয়ে অসন্তোষ দেখা দেয়।

তা ছাড়া সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর পর দেশে স্বৈরশাসন প্রবর্তন করেন, ৪ টি বাদে সব সংবাদপত্র বন্ধ, বিচার বিভাগের ক্ষমতা হ্রাস এবং সর্বোপরি জনগণের মৌলিক অধিকার খর্ব করার বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করায় আওয়ামী লীগ সরকার জনসাধারণ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

৩. সামরিক অভ্যুত্থান

সেনাবাহিনীর কতিপয় অফিসারের সঙ্গে সরকারের অপ্রত্যাশিত আচরণের কারণে তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। তাছাড়া আরো নানাবিধ কারণে সেই সময়ে জনগণের মনে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং সরকারের জনপ্রিয়তা দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে। এই সুযোগে কতিপয় অসাধু সেনা অফিসার ও স্বাধীনতা বিরোধীরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরিকল্পনায় মেতে ওঠে এবং নির্মমভাবে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে।

খুনীরা সেদিন যাঁদের হত্যা করে

১৫ ই আগস্টের ভোরে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের । মুজিবুর রহমান নিজ বাসভবনে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী বিশ্বাস ঘাতক অফিসারদের ভোর রাতে নিহত হন।

সেদিন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুন্নেছা, বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠপুত্র মুক্তিযোদ্ধা লে. শেখ কামাল, পুত্র লে, শেখ জামাল, কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল, দুই পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী কামাল, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের, ভগ্নিপতি ও কৃষিমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও তার কন্যা বেবী সেরনিয়াবাত, পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, দৌহিত্র সুকান্ত আবদুল্লাহ বাবু, ভ্রাতুস্পুত্র শহদী সেরনিয়াবাত, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবনেতা ও সাংবাদিক শেখ ফজলুল হক মণি ও তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি, বঙ্গবন্ধুর সামরিক সচিব কর্নেল জামিল আহমেদ এবং ১৪ বছরের কিশোর আবদুল নঈম খা ঘাতকেরা হত্যা করে।

এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুই কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শেখ হাসিনা ও শেখ রেহেনা দেশের বাহিরে থাকায় তাঁরা বেঁচে যান।

১৫ ই আগস্ট পরবর্তী ঘটনাসমূহ

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মহামানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ হবার পর দেশে সামরিক শাসন জারি করা হয়। গণতন্ত্রকে হত্যা করে মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, শুরু হয় হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি, কেড়ে নেয় জনগণের ভোটের অধিকার।

বিশ্বে মানবাধিকার রক্ষার জন্য হত্যাকারীদের বিচারের বিধান রয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশে জাতির জনকের আত্মস্বীকৃত খুনীদের বিচার থেকে রেহাই দেবার জন্য ২৬ শে সেপ্টেম্বর এক সামরিক অধ্যাদেশ (ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স) জারি করা হয়।

জেনারেল জিয়াউর রহমান সামরিক শাসনের মাধ্যমে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স নামে এক কুখ্যাত কালো আইন সংবিধানে সংযুক্ত করে। খুনিদের বিদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করে।

জড়িতদের বিচার কার্যক্রম

১৯৯৬ সালের ২৩ জুন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর ২ অক্টোবর ধানমন্ডি থানায় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের সদস্যগণকে হত্যার বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করা হয়।

১২ নভেম্বর জাতীয় সংসদে ইনডেনমিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়। ১ মার্চ ১৯৯৭ ঢাকার জেলা ও দারয়া জজ আদালতে বিচারকার্য শুরু হয়। ৮ নভেম্বর ১৯৯৮ সালে জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসূল ৭৬ পৃষ্ঠার রায় ঘোষণায় ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।

১৪ নভেম্বর ২০০০ সালে হাইকোর্টে মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিলে দুই বিচারক বিচারপতি মোঃ রুহুল আমিন এবং বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক দ্বিমতে বিভক্ত রায় ঘোষণা করেন।

এরপর তৃতীয় বিচারপতি মোঃ ফজলুল করিম ১২ জনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেন। এরপর ৫ জন আসামী আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল করে।

২০০২ – ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের সময় মামলাটি কার্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। ২০০৭ সালে শুনানির জন্য বেঞ্চ গঠিত হয়।

২০০৯ সালে ২৯ দিন শুনানির পর ১৯ নভেম্বর প্রধান বিচারপতিসহ পাঁচজন বিচারপতি রায় ঘোষণায় আপিল খারিজ করে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন।

২০১০ সালের ২ জানুয়ারি আপিল বিভাগে আসামীদের রিভিউ পিটিশন দাখিল এবং তিন দিন শুনানি শেষে ২৭ জানুয়ারী চার বিচারপতি রিভিউ পিটিশনও খারিজ করেন।

ওইদিন মধ্যরাতের পর ২৮ জানুয়ারি পাঁচ ঘাতকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ঘাতকদের একজন বিদেশে পলাতক অবস্থায় মারা গেছে এবং ছয়জন বিদেশে পলাতক রয়েছে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের দাবি ৩৪ বছর পর বাস্তবায়িত হলো।

১৫ ই আগস্ট ঘটনায় জড়িত ছিলেন যারা

সেদিন এই ঘৃণিত হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছিল কয়েকজন তরুণ অসাধু সেনা কর্মকর্তা। এদের মধ্যে মোট ১২ জন আসামীকে মৃত্যুদন্ডের আদেশ প্রদান করা হয়।

এরা হলেন, সেনা কর্মকর্তা সৈয়দ ফারুক রহমান, সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, বজলুল হুদা, শরিফুল হক ডালিম, এ এম রাশেদ চৌধুরী, খন্দকার আবদুর রশিদ, এ কে এম মহিউদ্দিন আহমেদ (ল্যান্সার), এম এইচ এম বি নূর চৌধুরী, আজিজ পাশা (মৃত), মুহিউদ্দিন আহমেদ, রিসালদার মোসলেম উদ্দিন ও আবদুল মাজেদ। এদের মধ্যে পাঁচজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

উপসংহার

১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্ট ছিল বাঙালি জাতির জীবনের একটি কালো অধ্যায়। তাই জাতি এই দিনটি পালন করে শোকের মধ্য দিয়ে। কেননা যিনি জাতির জনক তাঁকেই যদি এভাবে নির্মমভাবে খুন হতে হয় তাহলে এর চেয়ে বড় বেদনার মুহূর্ত ঐ জাতির জন্য আর হয় না। তাই এই দিনটি এ দেশের ১৬ কোটি মানুষ গভীর বেদনার সঙ্গে স্মরণ করে।